সৎ লোকের এতো অভাব কেন

অধ্যাপক গোলাম আযম

সৎ লোকের এতো অভাব কেন

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

ভূমিকা

বিশ্বে সৎ লোকের এতো অভাব কেন? ভালো মানুষের সংখ্যা বেশি হলে সমাজে শান্তি বিরাজ করতো। শান্তি কে না চায়! সবাই চাওয়া সত্ত্বেও শান্তির এতো অভাব কেন? জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। অতীতকালে রাজা-বাদশাহরাও যেসব আরাম-আয়েশ ভোগ করতে সক্ষম হয়নি, আজ সাধারণ মানুষও এমন অনেক সুখ ভোগ করতে পারছে।

কিন্তু এ কথা কি সত্যি নয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই অপরাধীরা মানব সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করছে? অতীতকালে মানুষ জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বোধ করতো। আজ স্বাভাবিক মৃত্যুরও সামান্য কোন নিশ্চয়তা নেই। রাজধানী ঢাকায়ও দিনের বেলা কলিং-বেল টিপে অস্ত্রের সাহায্যে ডাকাতি হয়। ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে নিরাপদে ফিরে আসবে কিনা এ চিন্তায় পিতামাতা উদ্বিগ্ন থাকে। দিনেও রাস্তায় অস্ত্রধারী ছিনতাইকারীদের ভয়ে সাবধান থাকতে হয়।

এ মহা মুসীবতের মূল কারণ সরকার ও দেশের চিন্তাশীলগণ তালাশ করেন কিনা জানি না। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির জ্বালায় সরকারও অস্থির। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও নিরাপত্তার অভাব প্রকাশ করেন। পুলিশ অফিসারও নিরাপদ নয়।

এ জ্বলন্ত বিষয়টি নিয়েই এ পুস্তিকায় আলোকপাত করা হয়েছে। এ কথাই প্রমাণ করা হয়েছে যে, সৎ লোক বা ভালো মানুষ গড়ার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা না থাকার কারণেই আজ মানবতা বিপন্ন। উন্নত প্রযুক্তি অসৎ লোকদের হাতে পড়ে সমাজে অশান্তি বৃদ্ধি করেছে। সৎ লোকের অভাবে এ উন্নতি অবনতির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক সভ্যতা সৎ লোক বানাতে ব্যর্থ হলো কেন? সমাজে সৎ লোকের অভাব কেন? সৎ লোক গড়ার উপায় কী? এ সব বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ তাআলা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালকদের এ সব কথা অনুধাবন-করার তাওফীক দান করুন।

গোলাম আযম
২৭ রামাদান, ১৪২৩ হিজরী

সূচিপত্র

সৎ লোকের গুরুত্ব	৫
সৎ লোকের পরিচয় কী?	৬
মানুষের দুটো সত্তা	৬
অপরাধ মানে কী?	৮
নাফস ও রূহের দ্বন্দ্ব	৯
মুক্তির একমাত্র পথ	৯
আধুনিক বিশ্ব মানুষ গড়ায় ব্যর্থ কেন?	১১
মানুষ গড়ার উপায় কী?	১২
নবীর শিক্ষার আলোকে মানুষ গড়া	১৪
সৎ লোকের শাসনের গুরুত্ব	১৫
সৎ লোক বানাবার উপায়	১৬
দীনদার লোকদেরকে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে	১৮
নামায-রোযা কিভাবে সৎ লোক বানায়	১৯
অপরাধমুক্ত সমাজ	২২
মানুষ প্রবৃত্তির দাস	২৩

সৎ লোকের গুরুত্ব

নির্বাচনের সময় সবাই ভোটারদেরকে নসীহত করেন যে, আপনারা সৎ লোককে ভোট দিন। ব্যবসায় শরীক হিসেবে সবাই বিশ্বাসযোগ্য সৎ মানুষ তালাশ করে। আত্মীয়তা করার সময়ও সততা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। নতুন জায়গায় বাড়ি করতে হলেও প্রতিবেশীরা সৎ কিনা জানা জরুরি মনে করা হয়। দোকানে কর্মচারী নিয়োগের সময়ও সৎ কিনা যাচাই করা হয়। অসৎ লোকও সম্পদ আমানত রাখার জন্য সৎ লোককেই বাছাই করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সৎ লোকের গুরুত্ব সবাই বুঝে।

কোন লোক সৎ কিনা তা কোন্ মানদণ্ডে যাচাই করা হয়? এটাই দেখা হয় যে, লোকটি মিথ্যা কথা বলে কিনা, ওয়াদা ভঙ্গ করে কিনা, ধার নিয়ে যথাসময়ে শোধ না করে তালবাহানা করে কিনা, বিতর্কের সময় ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে কিনা, গালিগালাজ করে কিনা ইত্যাদি জানার চেষ্টা করা হয়। এ ধরনের অভিযোগ না থাকলে ধরে নেওয়া হয় যে, লোকটি সৎ।

এককথায় বলতে গেলে যেসব কাজকে সবাই মন্দ মনে করে, কেউ যদি সে সব করে না বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলেই ধারণা করা হয় যে, লোকটি সৎ। যে সব কাজ মন্দ সে বিষয়ে মোটামুটি সবাই অবগত।

কুরআন মাজীদে ভালো কাজের জন্য আদেশ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ভালো কাজ ও মন্দ কাজ বুঝাবার উদ্দেশ্যে যে দুটো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা খুবই তাৎপর্য বহন করে। مَعْرُوْفٌ (মা'রূফ) শব্দ দ্বারা ভালো কাজ এবং مُنْكَرٌ (মুনকার) শব্দ দ্বারা মন্দ কাজ বুঝানো হয়েছে। মারূফ মানে পরিচিত। অর্থাৎ যা ভালো তা সবারই জানা। ভালোকে কেউ মন্দ মনে করে না। আর মুনকার মানে অস্বীকৃত। অর্থাৎ মানুষের বিবেক যা ভালো বলে স্বীকার করতে চায় না, তা-ই মন্দ।

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো, কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ তা মানুষ বুঝে। এ বিচারবোধকেই বিবেক বলে। যা ভালো তা বিবেক পছন্দ করে এবং যা মন্দ বিবেক তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

সৎ লোকের পরিচয় কী?

যে লোক বিবেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে সে-ই সৎ লোক। বিবেক যা করা ভালো বলে রায় দেয়, সে কাজই সে করে এবং যে কাজ মন্দ বলে আপত্তি জানায়, সে কাজ থেকে বিরত থাকে।

আমরা সবাই এ অভিজ্ঞতার অধিকারী যে, যখন কোন মন্দ কাজ করে ফেলি—যা করা উচিত নয়, তখন বিবেকের দংশন অনুভব করি। অর্থাৎ তখন মনে খারাপ লাগে।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, পাপ কী? তিনি জওয়াবে বললেন, 'তোমার মনকে জিজ্ঞেস করো।' আরেক হাদীসে আছে, 'যে বিষয়ে মনে খটকা লাগে তা করাই পাপ।' অর্থাৎ যা করা উচিত নয়, সে বিষয়ে মনে খটকা লাগারই কথা। এ কারণেই সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকাও তাকওয়ার দাবি। রাসূল (স) বলেন:

إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُؤْمِنٌ ـ

'যখন তোমার কোন ভালো কাজ তোমাকে খুশি করে এবং তোমার কোন মন্দ কাজ তোমাকে বেজার করে তখন (বুঝা গেলো) তুমি মুমিন।'

তাহলে বুঝা গেলো যে, মন্দ কাজ মুমিনের মনকে খুশি করে না। তার দ্বারা কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে তার মনে খারাপ লাগে। অনুতাপ আসে যে, আমার দ্বারা মন্দ কাজটা হয়ে গেলো। নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। অন্য মানুষকে যতোই ফাঁকি দেওয়া হোক নিজের কাছে তা ধরা পড়বেই। যে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করে সে নিজের বিচারেই অপরাধী।

মানুষের দুটো সত্তা

মানুষের মধ্যে দুটো জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে। একটি তার দেহ অপরটি কুরআনের ভাষায় রূহ। দেহ বস্তুগত উপাদানে তৈরি। আমরা দেহের পুষ্টির জন্য যতো বস্তু খাই সে সব যে উপাদানে তৈরি, আমাদের দেহও ঐ সব উপাদানে তৈরি বলে তা আমাদের দেহে ফিট হয়।

রূহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তিনি তাঁর রূহ থেকে আমাদের দেহে যা ফুঁ-দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন, সেটাই রূহ। এটা বস্তু নয়; এটা আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি।

দেহের কোন নৈতিক চেতনা নেই। কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ এ বিষয়ে দেহের কোন ধারণা নেই। কেউ চুরি করে কোন মিষ্ট জিনিস মুখে দিলে মিষ্টিই লাগবে; কিন্তু মনে মিষ্ট বোধের বদলে তিক্তবোধ হবে। কারণ মন জানে যে, এটা চুরির মাল। দেহের এ নৈতিক অনুভূতি নেই।

আমাদের শরীরটা গরু-ছাগলের মতোই পশু মাত্র। আমার প্রিয় গাভীটি আমার বাগানে ঢুকে গেলে আমার যত্নের গাছটি খেয়ে ফেলে। এটা যে ঠিক হয়নি তা বুঝবার কোন সাধ্য তার নেই। আমার দেহটিও তেমনি একটি অবুঝ পশু মাত্র।

দেহটি আসল মানুষ নয়; রূহই হলো আসল মানুষ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, সকল রূহকে তিনি একই সাথে সৃষ্টি করে জিজ্ঞেস করেছেন :

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ 'আমি কি তোমাদের রব নই।'

সব রূহ জওয়াবে বললো, بَلٰى شَهِدْنَا অর্থাৎ 'অবশ্যই তুমি আমাদের রব, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।'

এ থেকে বুঝা গেলো যে, রূহ এক ভিন্ন সত্তা, যা দেহ তৈরি হবার আগেই অস্তিত্ববান। এ রূহই হলো আসল মানুষ। সৃষ্টিগতভাবে সব মানুষ একই সাথে সৃষ্ট। কিন্তু সব মানুষকে একই সময়ে দেহ দান করা হয়নি। আল্লাহ যাকে দুনিয়ায় পাঠাতে চান তার মায়ের পেটে তার দেহ তৈরি করেন এবং এক সময় ঐ দেহে রূহকে আরোহণ করান। কুরআনে আরোহণ করা (رَكَّبَ) কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

এ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, মানুষের মধ্যে দুটো অস্তিত্ব রয়েছে। একটি বস্তুগত এবং অপরটি নৈতিক। একটি Material এবং অপরটি Moral existence.

পশু শুধু দেহসর্বস্ব, পশুর মধ্যে রূহ নেই। মানুষ দেহ সর্বস্ব নয়, দেহ ও রূহের সমন্বয়েই মানুষ।

দেহের যাবতীয় দাবিকে এক সাথে কুরআনে নাম দেওয়া হয়েছে نَفْس (নাফস)। দেহ বস্তু দিয়ে তৈরি বলে বস্তুজগতের প্রতি এর আকর্ষণ স্বাভাবিক। ক্ষুধা লাগলে সে খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। গরম বোধ করলে ঠাণ্ডা চায়। শীত লাগলে গরম জিনিস চায়। যৌন কামনা জাগলে তা পূরণ করতে চায়। এ সব দাবিকে নাফস বা প্রবৃত্তি বলা হয়।

অপরাধ মানে কী?

যা করা উচিত নয় তা করাই অপরাধ। কোন্টা করা উচিত নয়, তা বিবেক বলে দেয়। তাই বিবেকের মতের বিরুদ্ধে কাজ করাই অপরাধ। যে অপরাধ করে সে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হিসেবেই গণ্য। সে নিজকে অপরাধী মনে করে বলেই গোপনে অপরাধ করে। ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ধরা পড়লে অপরাধ করেনি বলে সাফাই গায়। প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সে অপরাধ করেছে বলে স্বীকার করে না। অপরাধ করার সময় সে সকল দিক দিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে, যাতে তাকে চিহ্নিত করা না যায়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অপরাধী জানে যে কাজটি করা অন্যায় ও অনুচিত। এ কাজটি করা উচিত নয় বলে জানা সত্ত্বেও সে জেনেশুনেই অপরাধ করে।

এ কারণেই কেউ যদি আখিরাতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দাবি করে যে, তার কাছে আল্লাহ ও রাসূলের বাণী পৌঁছেনি বলে সে বুঝতে পারেনি যে, সে অপরাধ করছে। তাহলে আল্লাহ এ কথার উপরই তাকে শাস্তি দেবেন যে, "তুমি জেনেশুনেই অপরাধ করেছো, তোমাকে আমি বিবেক দিয়েছিলাম।"

অপরাধীর বিবেক এতো দুর্বল যে, দেহের দাবি পূরণে সে বাধা দিতে অক্ষম। প্রবৃত্তির তাড়নায় সে অপরাধে লিপ্ত হয়। দুর্বল বিবেকের আপত্তি তাকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়।

নাফস ও রূহের দ্বন্দ্ব

আগেই বলেছি, দেহের নৈতিক চেতনা নেই, আর রূহই হলো নৈতিক চেতনাবিশিষ্ট। দেহ যা দাবি করে তা পূরণ করার মতো বস্তু পেলেই তা ভোগ করতে এগিয়ে আসে। নৈতিক দিক দিয়ে তা ভোগ করা উচিত কিনা সে চেতনা দেহের নেই। তাই যখন দেহ এমন কিছু ভোগ করতে চায় যা তার জন্য উচিত নয়, তখন রূহ আপত্তি জানায়। সে এমন কিছু খেতে চায়, যা অন্য লোকের মাল, তখন রূহ বাধা দেয়। যখন দেহ এমন কোন মহিলার সাথে যৌন সম্পর্ক করতে চায় যে তার বৈধ স্ত্রী নয়, তখন রূহ আপত্তি করে।

নাফস ও রূহের মধ্যে এ বিরোধ চলতেই থাকে। আমরা সবাই এর ভুক্তভোগী। নাফস ভোগ করার মতো যা নাগাল পায় তাই ভোগ করতে চায়। উচিত কি-না তা বিবেচনার সাধ্য তার নেই। হালাল ও হারামের কোন চেতনা নাফসের নেই।

চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, পকেটমারি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, ঘুষ, প্রতারণা, দখলবাজি, আত্মসাৎ, অপরহরণ ইত্যাদি অপরাধের মূলেই নাফসের তাড়না বা দেহের দাবি। সকল অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের মূলেই নাফস।

নাফসের নৈতিকতা বিরোধী তৎপরতায় রূহের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও রূহের বাধার পরওয়া না করেই নাফস তার দাবি পূরণ করতে থাকে।

তাহলে এর কি কোন প্রতিকার নেই? নাফস অব্যাহতভাবে সমাজে অশান্তি বৃদ্ধি করতে থাকলে শান্তি পাওয়ার উপায় কী? মানুষ কি চিরকাল অশান্তিই ভোগ করতে থাকবে? এ মুসীবত থেকে মুক্তির কি কোন পথ নেই?

মুক্তির একমাত্র পথ

মুক্তির পথ একটাই। রূহকে এমন শক্তিশালী করতে হবে, যাতে সে দেহকে পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মানুষের দেহসত্তার উপর নৈতিক সত্তার প্রাধান্য বিস্তার করার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোন বিকল্প পথ নেই। যা করা উচিত নয় তা থেকে দেহকে বিরত রাখার শক্তি রূহকে অর্জন করতে হবে।

কিভাবে এ মহান উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব তা জানার উপায় কী? কে আমাদেরকে এ বিষয়ে পথ দেখাতে পারে?

এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, কোন যন্ত্র যে বানায় এর সঠিক ব্যবহার তার কাছ থেকেই শিখতে হয়। তাই যন্ত্রের উৎপাদকের পক্ষ থেকে তা ব্যবহারের নিয়ম-কানুন (গাইড বুক) সরবরাহ করা হয়। সবাই ঐ গাইড বুক বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সাথে মেনে চলে। কারণ এ ছাড়া যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার অসম্ভব। গাইড বুক অমান্য করলে যন্ত্রটি অবশ্যই বিকল হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনি নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে গাইড বুক পাঠিয়েছেন। যুগে যুগে তারা বিভিন্ন মানব সমাজে ঐ গাইড বুক অনুযায়ী মানুষকে গড়ে তুলেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঠিক চিত্র উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ম শতাব্দীতে একটি অসভ্যতম মানব সমাজকে সভ্যতম সমাজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ব্যাপক অপরাধে লিপ্ত মানুষগুলোকে তিনি স্রষ্টার শেখানো বিধান অনুযায়ী পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। দেহসর্বস্ব জীবনধারায় গড়ে উঠা মানুষকে তিনি রূহের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে শিক্ষা দিলেন। মানুষকে পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে উন্নত মানুষে পরিণত করেন। অন্যের জান-মাল ও ইজ্জত লুট করা যাদের পেশা ছিলো তাদেরকে তিনি এ সব হেফাযত করার চেতনায় গড়ে তুলেন।

এমন অসম্ভবকে তিনি কেমন করে সম্ভব করলেন? বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত হওয়া উচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এতো উন্নতি সাধন করেও মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ বর্তমান সভ্যতার ধারক ও বাহকদের এ বিষয়টি বিবেচনা করা কর্তব্য।

আমেরিকার প্রখ্যাত গবেষক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট মাইকেল হার্টস তার "The Hundred" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানব জাতির ইতিহাস থেকে এমন একশ' জন লোকের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা বিভিন্নভাবে মানব সমাজকে প্রভাবিত করেছেন। এ তালিকায় তিনি সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নাম কেন উল্লেখ করেছেন এর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে ভূমিকায় বলেছেন যে, 'মুহাম্মদ

কোন রাজা-বাদশাহর ঘরে পয়দা হননি। এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিলেন। জন্মের পূর্বেই পিতৃহারা এবং শৈশবেই মাতৃহারা হয়ে দরিদ্র পরিবারেই প্রতিপালিত হন। উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক, তাঁর কোন অক্ষরজ্ঞানও ছিলো না। বিশ্বের সবচেয়ে অনুন্নত দেশে ছোট থেকে বড় হন। এমন এক ব্যক্তি কেমন করে গোত্রে গোত্রে বিভক্ত, লড়াইয়ে লিপ্ত চরম উচ্ছৃঙ্খল একটি মানবগোষ্ঠীকে এমন সুসংগঠিত ও সুসভ্য জাতিতে পরিণত করলেন, যার প্রভাব দ্রুত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। মানব জাতির উপর তাঁর প্রভাব বিস্ময়কর ও অতুলনীয়।'

আধুনিক বিশ্ব মানুষ গড়ায় ব্যর্থ কেন?

আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হলো বস্তুবাদ বা জড়বাদ (Materialism)। বস্তুসত্তার বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্বে জড়বাদীদের বিশ্বাস নেই। বস্তুসত্তা হিসেবে জড়বাদীরা মানুষকে দেহসর্বস্ব জীব মনে করে। রূহ যেহেতু বস্তু হিসেবে গণ্য নয় সেহেতু তারা তাকে চিনেই না। তাদের নিকট আসল মানুষই অপরিচিত।

তাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষের মেধা, চিন্তাশক্তি ও মননশক্তিরড়া বিকাশের জন্য যতো পরিকল্পনাই থাকুক, মানুষের নৈতিক সত্তার বিকাশের কোন ব্যবস্থাই নেই। তারা তো নৈতিক সত্তাকে স্বীকারই করে না। ভালো ও মন্দের বিচারবোধকেও তারা আইনের মাধ্যমেই পরিচালিত করতে চায়। মানুষ যাতে অপরাধ না করে এর জন্য তারা মযবুত শৃঙ্খলার (Descipline) বিধান রচনা করে।

তাদের মতে, মানুষকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখার জন্য দুটো ব্যবস্থাই যথেষ্ট: ১. লোক লজ্জা, ২. আইনের ভয়। অর্থাৎ অন্য মানুষের সামনে লজ্জায় অপরাধ থেকে মানুষ বিরত থাকে এবং আইনে শাস্তি পাওয়ার ভয়েও বিরত থাকে। কিন্তু গোপনে অপরাধের সুযোগ পেলে কে তাকে বিরত করবে? অথবা আইন যাতে নাগাল না পায় ও পুলিশ যাতে ধরতে না পারে, এমন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে কে বিরত রাখবে? আরো বড় কথা হলো, অপরাধ দমন করার দায়িত্ব যার উপর দেওয়া হয়, সে-ই যদি অপরাধের সহযোগী হয় তাহলে দমন করবে কে? যে দারোগাকে ডাকাতি বন্ধ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সে-ই যদি

ডাকাতির সম্পদের অংশীদার হয়, তাহলে ডাকাতি বেড়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। ক্ষেতের হেফাযতের জন্য বেড়া দেওয়া হয়। বেড়া যদি নিজেই ক্ষেত খায় তাহলে কে ফসল রক্ষা করবে?

তাই অপরাধমুক্ত সমাজ গড়তে হলে মানুষকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে সে গোপনেও অপরাধ করবে না, সম্পদ আত্মসাৎ করার অবাধ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তা করবে না এবং বিবেকের বিরুদ্ধে কোন অবস্থায়ই চলবে না। মানুষকে উন্নত নৈতিক মানে গড়ার ব্যবস্থা ছাড়া অপরাধ দমন কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমাদের দেশ সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও সকল প্রকার অপরাধের দিক দিয়ে বিশ্বে চ্যাম্পিয়নের মর্যাদায়(?) অধিষ্ঠিত। শুধু পুলিশ বিভাগ নয়; শিক্ষা বিভাগসহ সরকারি সকল বিভাগে ব্যাপক ঘুষ ও দুর্নীতিতে যারা লিপ্ত তারা কি অশিক্ষিত? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হলো কেন? কারণ একটাই। আধুনিক বিশ্ব-সভ্যতার অন্ধানুকরণেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত।

জড়বাদই এ সভ্যতার ভিত্তি। ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ তাদের আদর্শ। তারা Divine Guidance-এর ধার ধারে না। জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও মেধাকেই তারা যথেষ্ট মনে করে। স্রষ্টায় যারা বিশ্বাস করে তারাও স্রষ্টার বাণী হিসেবে কোন কথাকে গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাদের ধারণা, ওহী যেহেতু বস্তু নয়, সেহেতু অহীর জ্ঞান গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এ সভ্যতা মানুষ গড়ায় চরমভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মানুষ গড়ার উপায় কী?

মানুষের স্রষ্টাই মানুষ গড়ার উপায় শিক্ষা দিয়েছেন। আর কারো এ যোগ্যতা হতে পারে না। তিনি নবী-রাসূলগণকে মানুষ গড়ার দায়িত্ব দিয়েই পাঠিয়েছেন।

সত্যিকার মানুষ সে-ই, যে নাফসের গোলাম নয়। সে বিবেকের কথামতো চলে। বিবেকের বিরুদ্ধে দেহের দাবি পূরণ করে না। বিবেকের নিকট যা ভালো সে শুধু তা-ই করে। বিবেকের নিকট যা মন্দ তা থেকে সে বিরত থাকে। এ গুণের অধিকারী হওয়ার জন্য যে ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন, নবী-রাসূলগণ মানুষকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছেন।

তাঁরা প্রথমেই জনগণকে ডেকে বলেছেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

'হে আমার দেশবাসী! তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো। কারণ তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন হুকুমকর্তা নেই।' এ আহ্বান সাংঘাতিক বিপ্লবী ডাক। তোমরা মানুষ, তোমরা অন্য কোন মানুষের হুকুমের গোলাম হতে রাজি হবে কেন? কোন্ যুক্তিতে অন্য কেউ তোমার উপর প্রভুত্ব করবে। যারাই তোমাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায় তারা নিজের অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্যই তা করে। তোমাদের কোন কল্যাণ তাদের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

আল্লাহ তোমাদেরকে স্বাধীন সত্তা ও মর্যাদায় পয়দা করেছেন। আল্লাহই তোমাদের একমাত্র প্রভু ও হুকুমকর্তা। একমাত্র তাঁর দাসত্ব কবুল করলেই আর সবার গোলামি থেকে তোমরা মুক্তি পাবে। একমাত্র তিনিই নিঃস্বার্থ। তাই একমাত্র তাঁর গোলামিতেই তোমাদের কল্যাণ।

তিনি তোমাদেরকে পয়দা করেছেন এবং তোমাদের জন্যই দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র তাঁর দেওয়া বিধান মেনে চললেই তোমরা সকল অধিকার ভোগ করতে পারবে। আল্লাহর বিধানের বদলে যারা সমাজে মনগড়া বিধান চালু করে তারা নিজেদের স্বার্থে জনগণের অধিকার হরণ করে। তাই আর কারো গোলামি নয়; একমাত্র আল্লাহর গোলামিতেই শান্তি ও মুক্তি।

নবী-রাসূলগণের দ্বিতীয় আহ্বান হলো ঃ

হে মানুষ এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করো যে,

১. মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা হবে এবং ঐ জীবন চিরস্থায়ী হবে।

২. দুনিয়ার জীবনে ভালো ও মন্দ যতো কাজ করা হয় এর ফল পরকালীন জীবনে দেওয়া হবে। ভালো কাজের জন্য মহাপুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। মনে কোন কুচিন্তা করলেও তা আল্লাহ জানতে পারেন। তিনি সব সময় সবাইকে দেখেন। তাই তাঁকে সব সময় সর্বাবস্থায় ভয় করে চলো। তুমি যেসব মন্দ কাজ থেকে লোক-লজ্জার ভয়ে অথবা শাস্তির ভয়ে বিরত থাকো সেসব কাজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে বিরত থাকো।

নবী-রাসূলগণের তৃতীয় আহ্বান হলো ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ـ

'আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার ডাকে যারা সাড়া দেন, তাদেরকে সংগঠিত করার জন্যই এ আহ্বান। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো তাদেরকে গড়ে তুলবার জন্য নবীর নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী গড়ে তোলা যায়।

নবী-রাসূলগণের চতুর্থ দাওয়াত হলো :

اِجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ـ

'তোমরা তাগূত থেকে দূরে থাক।'

যেসব শক্তি মানুষকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য লোভ বা ভয় দেখায় বা বাধ্য করতে চায় ঐ সবকেই তাগূত বলে। রাসূলের আহ্বানের দাবি এটাই যে, সকল তাগূতী শক্তিকে অমান্য করার হিম্মত করতে হবে। এটা রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ দাওয়াত হলো সমাজ-বিপ্লবের ডাক।

তাই নবী ও নবীর নেতৃত্বে সংগঠিত 'বিদ্রোহী'-দেরকে দমন করার জন্য তাগূতী শক্তি সব রকম নির্যাতন চালায়। হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ফলেই এক সময় নবীর বাহিনী জনসমর্থন লাভ করে এবং আল্লাহর রাজত্ব বা খিলাফত কায়েম হয়।

নবীর শিক্ষার আলোকে মানুষ গড়া

রাসূল (স) একটি অরাজক দেশের মানুষকে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করে বিশ্বে নৈতিকতাভিত্তিক সভ্যতার প্রচলন করেন। বর্তমানে জড়বাদভিত্তিক ভোগবাদী সভ্যতার খপ্পরে মানব জাতি বিপন্ন। প্রবৃত্তির দাসত্ব করার শিক্ষাই মানুষ পাচ্ছে। তাই যেখানে লোক-লজ্জা ও আইনের ভয় নেই, সেখানেই মানুষ অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। বিবেকের বিরুদ্ধে চলার সুযোগ পেলে তা থেকে বিরত থাকার সাধ্য কম লোকেরই আছে।

এ চরম নৈতিক অবক্ষয় থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করতে হলে মানুষের মধ্যে নবীর শিক্ষার আলোকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও আখিরাতের শাস্তির ভয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। সকল প্রচার-মাধ্যমকে এ মহান উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে। তথাকথিত সংস্কৃতি ও দেহসর্বস্ব বিনোদন কর্মসূচি মানুষের পাশব প্রবৃত্তিকে উসকে দিচ্ছে। এ সব মাধ্যমকে মানুষের নৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে।

বলাবাহুল্য, এ মহাপরিবর্তন সরকারি উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না। বিনাবাধায় ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চলতে থাকলে বেসরকারি নির্মাণ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না।

মানব সমাজের সার্বিক নৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতার কারণে জনগণের মধ্যে যেটুকু অপরাধ-প্রবণতা অবশিষ্ট থেকে যাবে, তা কঠোর শাস্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

সৎ লোকের শাসনের গুরুত্ব

রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সরকারি দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যারা নিযুক্ত, তারা যদি আল্লাহ ও আখিরাতের ভয়ে বিবেকের বিরুদ্ধে চলা থেকে বিরত না থাকে, তাহলে তাদেরকে বিরত করার উপায় কী? আইনকে ভয় করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। কারণ তাদের হাতেই আইন। তারাই আইন প্রয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তারা আইন অমান্য করলে তাদেরকে কে পাকড়াও করবে?

দারোগা-পুলিশ চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার জন্য দায়িত্বশীল। তারা যদি ডাকাতদের সহযোগিতা করে তাহলে ডাকাতি বন্ধ করবে কে? ডাকাতি করে সংগৃহীত সম্পদে বখরা পাওয়ার লোভ যদি দারোগার থাকে, তাহলে ঐ থানায় অবশ্যই ডাকাতি বেড়ে যাবে।

যারা ঘুষ ছাড়া সরকারি দায়িত্ব পালন করে না, তারা নাগরিকদের বৈধ হক থেকে বঞ্চিত করে এবং অবৈধভাবে অন্যকে হকের চেয়ে বেশি দেয়।

দুর্নীতি দমনের জন্য নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের মধ্যে যদি দুর্নীতি থাকে তাহলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক।

সরকারি কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্যই বেতন দেওয়া হয়। তবুও ঘুষ ছাড়া তাদের কাছ থেকে কোন কাজ আদায় করা যায় না। অবৈধভাবে সম্পদ আহরণের নেশা সবাইকে যেনো পাগল বানিয়ে দিয়েছে। যারা ঘুষ খায় তারাও নিজেদের কাজ আদায় করার জন্য ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। এভাবে এক কলুষিত চক্র (Vicious Circle) সবাইকে ঘিরে ফেলেছে।

এ মুসীবত থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো সৎ লোক গড়ে তোলা ও সৎ লোকদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা। তাই সৎ লোক কেমন করে যোগাড় করা যায়, সে বিষয়ে দেশের সচেতন সব মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সৎ লোক বানাবার উপায়

বাড়ির আঙিনায় বাগান করতে চাইলে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আঙিনা এমনি ফেলে রাখলে জঙ্গলেই পরিণত হবে। জঙ্গল আপনা আপনিতেই হয়। বিনা চেষ্টায় বাগান হয় না। তেমনিভাবে সৎ লোক বিনা পরিকল্পনা ও বিনা চেষ্টায় গড়ে উঠতে পারে না। জনগণকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার কোন পরিকল্পনা নেই বলেই ব্যাপক হারে খুনি, ধর্ষক, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, পকেটমার, ছিনতাইকারী, ঘুষখোর, চোর, ডাকাত ও সমাজ বিরোধী লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সংস্কৃতি, বিনোদন ও নারী স্বাধীনতার নামে এমন সব অপতৎপরতা অবাধে চলছে, যার ফলে নৈতিক পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নৈতিকতা যেনো মূর্খদের সেকেলে কুসংস্কার, অশ্লীলতাই যেনো আধুনিকতা ও প্রগতির লক্ষণ।

গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের শাসনই চলে। তাই দেশে সৎ লোকের শাসন কায়েম করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। রাজনৈতিক দলগুলো যদি সৎ লোক গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ না করে তাহলে সৎ লোক কোথায় পাওয়া যাবে? সৎ লোক আসমান থেকে নাযিল হবে না। বিদেশ থেকে আমদানি করার মতো পণ্যও এটা নয়।

আমাদের দেশে এখনো দেশ গড়ার রাজনীতি চালু হয়নি। যা চলছে তা ক্ষমতার রাজনীতি। যেমন করেই হোক ক্ষমতায় যেতে হবে। নির্বাচনে জিততেই হবে। নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের আসল মাপকাঠি সততা ও চরিত্র নয়; প্রার্থীর প্রথম গুণ হতে হবে টাকাওয়ালা। নির্বাচনে প্রচুর টাকা খরচ করার সাধ্য থাকতে হবে।

দ্বিতীয় গুণ হলো, তার এমন কর্মী বাহিনী আছে কিনা, যারা তাকে যেমন করেই হোক বিজয়ী করতে সক্ষম। দলের দায়িত্বশীলদের কথা আলাদা। তাদেরকে নির্বাচিত করার জন্য দলের পক্ষ থেকেই অর্থের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু তাদের বাইরে প্রার্থী মনোনয়নের ভিত্তি সততা ও চরিত্র নয়। সে বৈধ উপায়ে বিত্তশালী হয়েছে কিনা তা দেখাও দলের দায়িত্ব নয়।

যারা কোটি টাকা দলকে চাঁদা দিয়ে নমিনেশন কিনে এবং আরো কয়েক কোটি টাকা নির্বাচনে খরচ করে পাস করে, তারা কি ক্ষমতাসীন দলের সুবিধাভোগী হিসেবে ঐ লগ্নী করা টাকা লাভসহ উদ্ধার করবে না? এভাবে যদি শাসকরাই অসৎ হয় তাহলে দেশে অসততাই বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

রাজনৈতিক দলগুলো যদি সত্যিই দেশ গড়ার পরিকল্পনা রাখেন, তাহলে তাদের দলকে সৎ লোকের কারখানায় পরিণত করতে হবে। দলের নেতৃত্ব সৎ ও নিঃস্বার্থ লোকদের হাতে থাকতে হবে। সমাজের অপেক্ষাকৃত সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে অগ্রসর করতে হবে। উন্নত নৈতিক মানের লোক তালাশ করতে হবে।

সমাজের সৎ ও চরিত্রবান লোকেরা অসৎ নেতাদের দাপটে দলের কাছে ঘেষতেও পারে না। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দলের মূল নেতৃত্ব সবচেয়ে সৎ ও যোগ্য লোকের হাতে থাকতে হবে।

এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন থাকাকালে দেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাস, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, দখলবাজি ও যাবতীয় সমাজবিরোধী তৎপরতা চালু করা হয়েছে। এ অধঃপতন থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হলে সৎ ও চরিত্রবান কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই তা বাস্তবে সম্ভব। এ কাজটি দেশের বাইরে থেকে এসে কেউ করে দিয়ে যাবে না।

সৎ ও চরিত্রবান লোকেরা রাজনৈতিক ময়দানে আসতে চায় না। এ ময়দানের ঝুঁকি বহন করার হিম্মত যাদের নেই তাদের সততা দেশের কোন কাজে লাগে না। রাসূল (স) যে রাজনীতি করেছেন, ঐ রাজনীতি করা যারা ফরয মনে করেন তাদের সৎ সাহস থাকারই কথা। সমাজকে অসৎ নেতৃত্ব থেকে উদ্ধার করতে হলে সৎ লোকদেরকে রাজনীতিতে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। এ ঝামেলায় জড়িত না হয়ে নিরাপদে নাজাত পাওয়ার সহজ পথ রাসূল (স) দেখাননি।

দীনদার লোকদেরকে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দীনদার লোকেরা কুরআনের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ চেষ্টা না করার কারণেই দেশে অসৎ লোকের শাসন অব্যাহতভাবে চলছে। মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, ওয়াজ ও তাবলীগের মাধ্যমে যারা দীনের খিদমতে নিয়োজিত আছেন, তারা মানুষকে সৎ বানাবার চেষ্টাই করছেন। কিন্তু তারা দীন কায়েমের রাজনীতি করেন না বলে তাদের সততার সুফল জনগণ ভোগ করতে পারছে না এবং তাদের সংস্পর্শে ও প্রভাবে জনগণের মধ্যে যারা সৎ হয়ে চলার চেষ্টা করে তারাও ইকামাতে দীনের আন্দোলনে এগিয়ে আসে না। দীনের খাদেমগণ রাজনৈতিক ময়দানে না আসলে তাদের সাগরিদরা ইসলামী রাজনীতি কার কাছে শিখবে?

রাজনৈতিক ময়দান আরাম-আয়েশের ময়দান নয়। দীনে হককে বিজয়ী করার রাজনীতি করতে হলে দীনে বাতিলের সাথে সংঘর্ষ হবেই। নবী-রাসূলগণের মতো উন্নতমানের মানুষকেও বাতিলের হাতে নির্যাতিত হতে হয়েছে। খিদমতে দীনের সাথে বাতিলের কোন বিরোধ নেই। ইকামাতে দীনের আন্দোলনকে বাতিল শক্তি কিছুতেই বরদাসত করে না। বাতিলের মুকাবিলা করে হক দীনকে বিজয়ী করার কঠিন পথ এড়িয়ে নিরিবিলি শুধু দীনের খিদমত করে সন্তুষ্ট থাকলে কিভাবে দীন কায়েম হবে?

এ দেশের জনগণ আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে ভালোবাসে এবং কুরআনকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। দীনের সকল খাদেম যদি রাজনৈতিক ময়দানে নেমে জনগণকে এ পথে ডাক দেন, তাহলে তারা অবশ্যই সাড়া দেবে। জনগণ তো ইমাম, খতীব, ওয়ায়েয, পীর, মাদরাসার শিক্ষক ও আলেম-ওলামাদের কাছ থেকেই ইসলামের আলো পেয়েছে। তাই তারা যদি দীনের দাবি হিসেবে জনগণকে ইকামাতে দীনের দাওয়াত দেন, তাহলে জনগণ কেন সাড়া দেবে না?

দীনের খাদেমগণ সবাই ইকামাতে দীনের আন্দোলনে এগিয়ে না আসার কারণেই বেদীনদের নেতৃত্ব কায়েম আছে। জনগণ ভোট দিয়ে শাসন ক্ষমতা তাদের হাতেই তুলে দেয়। জাতীয় সংসদ থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত রাজনীতির

ময়দান বেদীনদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দীনের খাদেমগণ দেশে অসৎ লোকের শাসন কায়েম করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

কুরআন মানব জাতির ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথাই ঘোষণা করেছে যে, সকল অশান্তি, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার মূল কারণ মানুষের মনগড়া আইন ও অসৎ লোকের শাসন। আর যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এসেছেন আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের জন্য।

এ দেশে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে হলে দীনের সকল খাদেমকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তারা যদি এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা ত্যাগ না করেন, তাহলে অসৎ লোকের শাসন অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন কিনা তা বিবেচনা করবেন।

প্রত্যেক মুসলিমের এ চেতনা থাকতে হবে যে, সে আল্লাহর সৈনিক। শয়তানের রাজত্বের অধীনে দীনদার হিসেবে কোন রকমে জীবনটা কাটিয়ে বেহেশতে যাবার স্বপ্ন দেখাবার জন্য কোন নবী দুনিয়ায় আসেননি। শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর রাজত্ব কায়েমের সংগ্রামই নবী-রাসূলগণ করে গেছেন। যারা আল্লাহর সৈনিকের দায়িত্ব পালনের হিম্মত করেছেন, তারাই নবীর সাহাবীর মর্যাদা পেয়েছেন। আর যারা নবীর প্রতি ঈমানের দাবিদার হয়েও সৈনিকের ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেনি তারা মুনাফিক বলেই চিহ্নিত হয়েছে।

নামায-রোযা কিভাবে সৎ লোক বানায়

আগেই বলা হয়েছে যে, বিবেকের বিরুদ্ধে যে চলে না সে-ই সৎ। বিবেক মন্দ কাজে আপত্তি জানায়। এ আপত্তির কারণে যে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে সে অবশ্যই ভালো মানুষ। সে আর কোন লোকের ভয়ে নয়, একমাত্র বিবেকের তাড়নায়ই মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। দেহ মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে এ আকর্ষণকে বর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ গোপনেও সে মন্দ কাজ করে না।

নামায ও রোযা বিবেকের এ শক্তি যোগায়। যে আল্লাহর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে নামায-রোযা করে সে এমন কাজ করে না, যার ফলে নামায ও রোযা

নষ্ট হয়ে যায়। সে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে। তাই শুধু আল্লাহর ভয়েই এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকে, যা করলে নামায ও রোযা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে জামাআতে শরীক হওয়ার পর হঠাৎ মনে পড়লো যে তার ওযূ নেই, ওযূ আছে মনে করেই নামাযে শরীক হওয়ার পর টের পেলো যে, ভুলে ওযূ করা হয়নি। তার যে ওযূ নেই সে কথা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। আর কেউ এ কথা জানে না বলেই কি সে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বিনা ওযূতেই নামায পড়বে? নিশ্চয়ই সে তা করবে না। কারণ আর কেউ না জানলেও আল্লাহতো নিশ্চয়ই জানেন। তাই সে নামায ছেড়ে দিয়ে ওযূ করে এসে আবার নামাযে শরীক হবে। এভাবে নামায তাকে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলতে শেখায়।

ক্ষুধা ও পিপাসায় যতো কষ্টই হোক, কোন রোযাদার কি অন্য লোকদের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে কিছু খেয়ে ফেলতে পারে? কে তাকে বারণ করে? সে জানে যে আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ তো অবশ্যই দেখবেন। এভাবে শুধু আল্লাহর ভয়ে কিছু খাওয়া থেকে সে বিরত থাকে।

লোক-লজ্জার ভয়ে অথবা আইন ও পুলিশের ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলেও গোপনে যে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে মোটেই সৎ নয়। গোপনেও যাতে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা যায় এমন ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতে হলে মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, যারা নামায-রোযা করে তারা কি সবাই অপরাধ থেকে বিরত থাকে? নামায পড়েও ঘুষ নিতে দেখা যায়, রোযা রেখেও মিথ্যা কথা বলে। এ জাতীয় লোকেরা নামায-রোযার উদ্দেশ্য না বুঝে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের উদ্দেশ্যে নামায-রোযা করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে" এবং রোযা তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করে চলা শেখায়। আল্লাহর কথা তো মিথ্যা হতে পারে না। ঐ জাতীয় লোকদের নামায-রোযা আসলেই আল্লাহর নির্দেশিত নামায-রোযা নয়। আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে নামায-রোযা করতে আদেশ করেছেন, তারা সে উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

মাওলানা মওদূদীর তাঁর 'নামায-রোযার হাকীকত' বইতে একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে এ বিষয়টি বুঝিয়েছেন। উদাহরণটি হলো ঃ যারা পুলিশের চাকরিতে ভর্তি হয়, তাদের একটি ট্রেনিং হলো 'চানমারী'। একটি নির্দিষ্ট চিহ্নিত জায়গায় গুলি করতে করতে হাত সই করার কাজটিকেই চানমারী বলা হয়। পুলিশকে চাকরি জীবনে চোর, ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের গুলি করতে বললে যাতে ঠিকমতো গুলি লাগাতে পারে সে জন্যই এ ট্রেনিং দেওয়া হয়। কোন বোকা পুলিশ যদি এ উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে তাহলে সে নিশানা দেখে শুধু গুলি করতে থাকার কাজটিকেই পুলিশের কাজ মনে করতে পারে। এ বোকার হাত সই হলেও তার জীবনে এর উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। কারণ সে উদ্দেশ্যটাই বুঝেনি। তাই যখন তাকে ডিউটি করার সময় কোথাও গুলি করতে নির্দেশ দেওয়া হয় তখন সে চানমারী করার সময় যে নির্দিষ্ট চিহ্ন দেখে গুলি করতো সে চিহ্ন এখানেও তালাশ করবে। চিহ্ন না পেয়ে হুকুমকর্তাকে জিজ্ঞেস করবে, ঐ চিহ্নটি তো দেখা যাচ্ছে না, কোথায় গুলি করি?

নামায-রোযার উদ্দেশ্য না বুঝে শুধু সওয়াবের আশায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে যারা নামায-রোযা করে তাদেরকে ঐ বোকা পুলিশের সাথে তুলনা করা যায়। ঐ পুলিশের যেমন চাকরি থাকবে না, এ ধরনের নামায-রোযাও কোন সুফল দেবে না।

কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তই ঘোষণা করা হয় যে, "আমি একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী চলবো। আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানবো না এবং রাসূল (স) ছাড়া আর কারো তরীকা গ্রহণ করবো না।"

পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে এরই অনুশীলন করা হয়। ২৪ ঘন্টার রুটিন শুরুই হয় ফজরের নামায দিয়ে এবং শেষ হয় ইশার নামায দিয়ে। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের মর্জিমতো কিছুই করার অনুমতি নেই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখ ও মন নামাযের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ীই কাজ করবে।

নামায শেষ হলে দুনিয়ায় দায়িত্ব পালনে রত হবে। কিন্তু আবার যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশায় এ অনুশীলন করতে থাকবে, যাতে দু'নামাযের মাঝখানেও যা

কিছু করবে তাও আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো করতে অভ্যস্ত হয়। এভাবেই নামাযের শিক্ষাটাকে নামাযের বাইরেও কায়েম করতে হবে।

রোযা রাখা অবস্থায় হালাল খাওয়াও হারাম করা হয়েছে। এ কথা শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ যখন খেতে বলবেন তখন খাবে, যখন নিষেধ করবেন তখন খাওয়া বন্ধ করবে। অর্থাৎ রোযা দুনিয়া ভোগ করার এ নিয়মই শেখায় যে, একমাত্র আল্লাহর হুকুম অনুযায়ীই সবকিছু ব্যবহার করতে হবে। এভাবেই নামায ও রোযা নাফসের গোলামি ত্যাগ করে আল্লাহর গোলাম হওয়ার যোগ্য বানায়। তাই নামায-রোযা সৎ লোক বানাবার শক্তিশালী মাধ্যম।

অপরাধমুক্ত সমাজ

পরিবারের সকল সদস্য যদি এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকে, যা করা উচিত নয়, তাহলে ঐ পরিবারে কোন অশান্তি থাকতে পারে না। তেমনিভাবে সমাজে যদি কেউ অপরাধ না করে তাহলে সে সমাজে সবাই পরম শান্তি ভোগ করবে।

অপরাধ মানে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করা। যে অপরাধ করে সে কি জানে না যে, সে যা করছে তা মন্দ? সে বিবেকের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই প্রবৃত্তির তাড়নায় অপরাধে লিপ্ত হয়। তাই সমাজকে অপরাধমুক্ত করতে হলে মানুষের বিবেককে জাগাতে হবে এবং বিবের্ককে এমন শক্তিশালী করতে হবে, যাতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

সব দেশে এবং সব কালেই সরকার শিক্ষাব্যবস্থা এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখতে চায়। তবুও তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে অপরাধ বেড়েই চলে। এর মূল কারণ এটাই যে, তারা সবকিছুই করে বটে; কিন্তু আসল কাজটিই করে না। বিবেককে শক্তিশালী করার পদ্ধতি তারা জানে না।

আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয় এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তির ভয়ই বিবেককে শক্তিশালী করার একমাত্র উপায়। আধুনিক সভ্যতা আল্লাহর কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় আল্লাহ অনুপস্থিত। আইন প্রয়োগকারী আল্লাহকে নিয়ে মাথা ঘামায় না; বিচারক আল্লাহকে ভয় করে রায় দেয় না।

মানুষকে বিবেকবান বানাবার কোন পরিকল্পনাই নেই। শুধু আইন ও শৃঙ্খলা কায়েমের মাধ্যমে অপরাধ দমনের নিষ্ফল চেষ্টা চলছে। স্রষ্টার বিধানকে অগ্রাহ্য

করে চলার প্রবণতা বিশ্বে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। আধুনিক সভ্যতা পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডলকে জয় করার গর্বে বিভোর। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তিকে জয় করার কৌশল আয়ত্ত করতে না পারায় সকল বিজয়ই পরাজয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে।

মানুষ প্রবৃত্তির দাস

দেহের যাবতীয় দাবির নামই হচ্ছে নাফস বা প্রবৃত্তি। মানুষ এ প্রবৃত্তিরই দাস। দেহ নৈতিক চেতনাহীন পশু। তাই প্রবৃত্তির দাসত্ব করে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে। প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়ই হলো আল্লাহর দাসত্ব। মানুষ যদি আল্লাহর দাস হিসেবে জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তবেই সে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে।

আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার বাহকরা আল্লাহর দাসত্বের কোন ধারণাই রাখে না। তাই তাদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ও তাদের পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থায় কোন মানুষ যতোই উচ্চশিক্ষিত হোক এবং যতো উচ্চ মর্যাদায়ই অধিষ্ঠিত হোক, সে প্রবৃত্তির দাসই থেকে যায়।

আমেরিকার জনপ্রিয় ও সফল প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আধুনিক সভ্যতারই ফসল। তিনি দু'মেয়াদে ৮ বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ্যতার সাথে শুধু আমেরিকার নেতৃত্বই নয়; গোটা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এতো বড় মর্যাদাবান ব্যক্তিও বিমানে নিরিবিলি পেয়ে বিমানবালাকে যৌন-নির্যাতন করেছেন। হোয়াইট হাউসে কর্মরত মনিকা লিউনস্কি তার যৌনক্ষুধা মেটাতে বাধ্য হয়েছেন। এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, উচ্চশিক্ষা ও মহান মর্যাদাও ক্লিনটনকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারেনি।

একমাত্র আল্লাহর দাসত্বই মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। অথচ আমাদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে আল্লাহর দাস হিসেবে গড়ে তুলবার কোন ব্যবস্থা তো দূরে থাকুক, এর সামান্য চেতনাও নেই।

রাসূল (স) আরবের অসভ্য মানুষগুলোকে সভ্যতার উস্তাযে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহর দাস হিসেবে মানুষ গড়ার কারণেই যে তিনি এতো বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিলেন, সে কথা অনুধাবন করার যোগ্যতা কি আমাদের আছে?

সমাপ্ত